সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

কুমারখালীর নিরক্ষরদের ভাষা

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ*

বাংলাদেশ আদমশুমারী (১৯৯১) অনুযায়ী কুমারখালীর জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ২৪.৯%। এই ২৪.৯%-এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই রয়েছেন। তাহলে কুমারখালীর সিংহভাগ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ শতকরা ৭৫.১ জন লোকই নিরক্ষর। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ ও কর্মের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে সে অঞ্চলের অর্থনীতি, একথা বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। নিরক্ষর লোকের মুখের ভাষা ও তার ব্যবহারের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কুমারখালীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, তা বললেও সম্ভবত ভুল বলা হবে না। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে এর মধ্যেকার নারী-পুরুষ ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত বাস্তবতাকে বিবেচনায় রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কুমারখালীর নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভাষা আলোচনা ও বিশ্লেষণের পূর্বে কুমারখালীর উপভাষাগত অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। সাক্ষর ভাষা-ভাষীদের মধ্যে যেমন ভাষা প্রমিতকরণ রূপের প্রয়োগ-রীতি লক্ষ করা যায়, নিরক্ষর লোকদের ভাষা প্রয়োগরীতিতে তা অনুপস্থিত থাকে। প্রমিত ভাষার বিষয়টা কী তা আদৌ নিরক্ষর লোকেরা বোঝেন না বা জানেন না। এই না-বোঝার বা না-জানার কারণ হলো, তাঁরা স্কুলে গিয়ে লেখা-পড়া করেন নি। পাঠ্যপুস্তকের ভাষার সাথে নিরক্ষর লোকদের পরিচয় থাকে না।

তবে এমন কিছু সংখ্যক নিরক্ষর লোক কুমারখালীতে আছেন যাঁরা সামাজিকভাবে বেশ মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এঁদের ভাষা ব্যবহার যথেষ্ট মার্জিত ও সমাজরীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। "সমাজে বাস করতে হলে ব্যবস্থার সাথে খাপ্ খাইয়ে নিয়ে যে ভাষার ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-ভাষাই সামাজিক ভাষা। এর উল্টোটার নাম হল অসামাজিক ভাষা। 'অসামাজিক-ভাষা' ব্যবহার করে সমাজে বাস করা যায় না—একথা বোধ হয় না বললেও চলে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা এমনই যে, এতে বয়সের প্রশ্ন, মান-মর্যাদার প্রশ্ন, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রশ্ন, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি কত কিছুর প্রশ্ন যে জড়িয়ে আছে, তার কোন সীমা নেই। সমাজের এ-সব অবস্থার কথা মেনে নিয়েই ভাষার ব্যবহার করতে হয়। নতুবা সমাজে বাস করা কঠিন। আমরা সমাজের এত সব দাবীকে সন্তুষ্ট করে যে ভাষা ব্যবহার করি তাকেই 'সামাজিক ভাষা' বলে উল্লেখ করতে পারি।"[১]

---

* প্রভাষক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

মানব শিশু যে-সমাজে জন্মগ্রহণ করে, যে ভাষিক এলাকায় বেড়ে ওঠে, শিশু সে এলাকার ভাষা আয়ত্ত করে থাকে বা শিখে থাকে। ভাষা শেখার পাশাপাশি সমাজের রীতি-নীতিও শিশু শেখে। ভাষা শেখার পাশাপাশি সমাজের রীতি-নীতি শিশু শিখে থাকে বড়দের কাছ থেকে। লেখাপড়ার বা শিক্ষার যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, শিশু তার দুটি নিজে নিজেই সমাজ থেকে আয়ত্ত করে থাকে। শিক্ষার চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো :

ক. শোনা

খ. বলা

গ. পড়া এবং

ঘ. লেখা।

তাহলে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী বলতে শিক্ষার দুটি বিষয় সম্বন্ধে যাঁরা অজ্ঞাত থাকেন, তাঁদের বোঝানো যেতে পারে। শিশু বড় হয়ে একদিন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় অথবা সিদ্ধান্ত দেয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া বা দেওয়ার সাথে যা জড়িত, তা হলো তার মেধার তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধির বহির্প্রকাশের রূপায়ণ। ভাষার মাধ্যমে মানুষের মননের প্রতিফলন ঘটে। ভাষাকে মানব মনের দর্পণের সাথে তুলনা করা যায়। মানুষের মননের অপরিস্ফুটিত রূপটি শিক্ষার ছোঁয়ায় বিকাশ লাভ করে থাকে। নিরক্ষর ভাষাভাষী শিক্ষার যে দুটো দিক সম্বন্ধে জ্ঞাত তা হলো :

ক. শোনা এবং

খ. বলা।

ভাষার ক্ষেত্রে শোনার সাথে বোঝার একটি সম্পর্ক আছে এবং বলার সাথে বোঝানোর বিষয়টি জড়িত। যে শিশু জন্মের পর থেকে–

গ. পড়া এবং

ঘ. লেখা

সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা না-পেয়ে বড় হয়েছে অর্থাৎ নিরক্ষর রয়ে গেছে, তাদের ভাষা বিশেষভাবে সমাজনির্ভর ও এলাকানির্ভর হয়ে থাকে। এদের ভাষা থাকে অনেকাংশেই অবিকৃত। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষা-ই এক একটি উপভাষা। এলাকানির্ভর কোন উপভাষা-ই হয়তো বা কোন দেশের সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়ে মান ভাষার মর্যাদা পেয়ে থাকে, অথবা দেশের বা রাষ্ট্রের কাজ চালানোর জন্য কোন একটি উপভাষাকে বেছে নিয়ে তাকে একটু ঘষা-মাজা করে মান ভাষায় উন্নীত করা হয়ে থাকে।

নিরক্ষর ভাষা-ভাষীরা সাধারণত মান ভাষা বা শিষ্ট ভাষার ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয়। তাঁরা তাঁদের এলাকার ভাষা-ই সাধারণত ব্যবহার করে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, "কোন দেশে বা অঞ্চলে চলিত বা প্রচলিত ভাষার পাশাপাশি এক বা একাধিক আঞ্চলিক বা উপভাষা ব্যবহৃত হয়। চলিত ভাষার সঙ্গে উপভাষার সামাজিক ব্যবধান রূপমূল ও ব্যাকরণগত কাঠামোয় লক্ষ করা যায়। চলিত ভাষার স্বরাঘাত, উচ্চারণ বা রূপমূল গঠনে যে প্রকৃতি বিদ্যমান, উপভাষায় তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। সাধারণভাবে লক্ষ করা যায় যে, প্রচলিত ভাষায় ভাষাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অথবা ভৌগোলিক ব্যবধান, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসগত পার্থক্যের জন্যে উপভাষার সৃষ্টি হয়।

এক্ষেত্রে চলিত ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহৃত হয় এবং লিখিত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, উপভাষা অঞ্চলবিশেষে চলিত ভাষার স্থান দখল করে। ভৌগোলিক বা সামাজিক ব্যবধানের জন্য একটা অঞ্চলে একাধিক উপভাষা গঠিত হতে পারে এবং অঞ্চল বিশেষের উপভাষার মধ্যে ধ্বনি বা রূপমূল গঠনে পার্থক্য দেখা দিতে পারে।"[২] তাহলে যাঁরা নিরক্ষর তাঁরা এলাকাগত ভাষা অর্থাৎ উপভাষা ব্যবহার করেন, তাঁদের ভাষা ব্যবহারেও পার্থক্য দেখা দিতে পারে। কুমারখালী বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। কুমারখালীর উপভাষার বিষয়ে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো, "ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ভাষাবিদ পণ্ডিত Sir G. A. Grierson-এর সম্পাদনায় ভারতীয় উপমহাদ্বীপের ভাষাগুলির বিবরণী The linguistic Survey of India নামক গ্রন্থাবলীতে ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে দেশে ভাষাবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং বিবরণী সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। যা হোক ব্রিটিশ সরকারের কীর্তি এই ভাষা বিবরণীই আমাদের উপভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের একমাত্র সোপান না-হলেও আমাদের প্রধান অবলম্বন। নানা অবশ্যম্ভাবী ক্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রিয়ার্সনের অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি বাংলা ভাষার উপভাষাগুলিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভেদে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। পাশ্চাত্য বিভাগের উদীচ্য শাখার বিরাজভূমি হিসাবে তিনি দিনাজপুর, পূর্ব মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনা জেলাগুলোকে গণনা করেছেন। এগুলো এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। রাজবংশী বা রংপুরী শাখা রংপুর, জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ), গোয়ালপাড়া (আসাম) ও কোচবিহারে (পশ্চিমবঙ্গ) প্রচলিত। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কথ্যভাষা পাশ্চাত্য বিভাগের কেন্দ্রীয় শাখার।"[৩]

'পাশ্চাত্য বিভাগ' :

ধ্বনিতত্ত্ব : মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণ, চ বর্গ, ড়, ঢ়, আদি হ এই সকলের প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষিত। শ, ষ, স স্থানে (কয়েকটি যুক্ত ব্যঞ্জন ভিন্ন) শ উচ্চারণ।

রূপতত্ত্ব : কর্মকারকের এক বচনে ক, কে। অতীতকালের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়ার 'এ' বিভক্তি– সে দিলে ইত্যাদি। (আসামী ভাষাতেও এই রূপতত্ত্ব আছে) ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষ বে। কেন্দ্রীয় শাখা– কলিকাতা, হাওড়া, তমলুক ও ঘাটাল (মেদিনীপুর জেলা), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া মহকুমা (বর্ধমান জেলা)। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কথ্যভাষা (যা পূর্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল) এই শাখাভুক্ত। এখানকার কথ্যভাষায় পাশ্চাত্য বিভাগের বিশিষ্ট লক্ষণগুলো বিদ্যমান।[৪]

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে The linguistic Survery of India প্রকাশিত হতে থাকলে, এখন থেকে ৯৭ বৎসর পূর্বে উপভাষা জরিপসংক্রান্ত এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া শুরু করেছিল। বর্তমানে কুমারখালী কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত (যা পূর্বে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল)। কুমারখালীর ভাষা যথেষ্ট শ্রুতিমধুর ও চলিত ভাষার মত। তবে কুমারখালীর ভাষায় আঞ্চলিকতার বিষয়টি যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। আর এ আঞ্চলিকতা ফুটে ওঠে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভাষায়। কুমারখালীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে দিকটি লক্ষ করা যায়, তা হলো কুমারখালীকে পৃথক করা গড়াই নদীর যে পাড়ে পৌর এলাকা অর্থাৎ শহর রয়েছে তা বাদে অন্য এলাকার ভাষায় আঞ্চলিকতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। কুমারখালীর শহরসংলগ্ন একটি মৌজার নাম হলো দুর্গাপুর। দুর্গাপুরের নিরক্ষর লোকদের ভাষা ব্যবহারের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁরা কুকুরকে 'কত্তা/কুত্তে',

কেঁচো'কে 'কেচে', 'যেতে পারবো না' কে 'যাবার পারবো নানে/য্যারের পারবো নানে' ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। তবে গড়াই নদীর অপর পাড়ের লোকদের ভাষা চলিত ভাষার কাছাকাছি। নিচে কুমারখালীতে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ যা কুমারখালীর আঞ্চলিকতা নির্দেশ করে, তার কিছু উদাহরণ দেখানো হলো। একই সাথে শব্দের বা শব্দগুচ্ছের অর্থ প্রচলিত ভাষায় দেওয়া হলো।

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	**অর্থ**	**কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ**	**অর্থ**
দ্যাহো	দেখ	উটপি	উঠবে
ক্যাম্মা/ক্যাম্বা	কেমন	নাত্রি	রাত্রি
হতি হতি	হতে হতে	হবিনানে	হবে না
খালে গেছে	আঁচড় লেগেছে	ক্যা	কেন
তাইতি	সেজন্য	ছাওয়াল-পাল	ছোট ছেলে-মেয়ে
হয়া	হয়ে	ইয়ারকি মারে	দুষ্টুমি করে
অ্যাকমোত্তরে	খুব তাড়াতাড়ি	কাঁদাস	কাঁদানো
হেনে	এখানে	যাহ্	যাও
নুন চাকতি ডাকতেছে	তরকারির লবণ দেখার জন্য ডাকছে	কিডা	কে
টাহা	টাকা	মারেছে	মেরেছে
থাহে	থাকে/আছে	চুলো	চুলা
খ্যায়া খ্যায়া ব্যাঙ হয়ছে	খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে	আচকে	আজকে
দি আইগা	দিয়ে এসো	ধুয়ে	ধোয়া
ধত্তি	ধরতে	দিলি	দেয়া
যাবিনি	যাবে/যাওয়া	দিয়াসতি	দিয়ে-আসা
কইছিলাম	বলেছিলাম	থাল	প্লেট
উটকোচ্চে	খুঁজছে	পাত্তিছিনে	পারছিনে
শন্যি	শূন্যে	চেন্ন	চিহ্ন
নড়ি/লড়ি/নাটি	লাঠি	পিসাদ্দেছে	চাপ দিয়েছে
লো	মেয়েলি সম্বোধন	পার	উপর
কাল	আগের দিন/পরের দিন	কয়ডা	অল্প
কি হাল করে	কি রকম করে	ব্যাল	বেল
রাঁদিছিলাম	রান্না করেছিলাম	দ্যাহলাম	দেখলাম
খা	খাও	ঠ্যাকাবি	ঠেকানো/ঠেকাবে
হেনে	এখানে	ভরা	সম্পূর্ণ
কোনে	কোথায়	শাগ	সবজি
তাও	তবুও	যন্তোনা	ঝামেলা
প্যাটের	পেটের	জালানো	দুষ্টুমি করা

ধুপি পিটে	ভাঁপা পিঠা	ফুল আলা	ফুলওয়ালা
বয়গা	বসগে	হইছে	হয়েছে
মেছেক	মিছাক(দাঁত পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়)	পালাম	পেলাম
নিয়াইছেরে	নিয়ে এসেছে কি না	ঘাটা	ঘন্টো
বসার ঢক	বসবার ধরন	খাতি	খেতে
গিলাশ	গ্লাস		
বাটি মাটি	বাটি ও অন্যান্য থালাবাসন	বইছে	বসেছে
কুকরো/কুকড়ো	মোরগ-মুরগী	কোনে	কোথায়
দৌড়ি	দৌড়ে	ৰয়ছে	রয়েছে
যাওয়াজ্জো	যাওয়ার মত	খাবিনানে	খাবে না
বচ্চেন	বুঝেছেন	দে	দাও
কোনে	কোথায়	জন্যি	জন্য
পরভাতে	শেষ রাতে/সেহরির সময়	কিডা	কে
কুশর	আখ	অ্যাহলাই	একাই
গুদো	ধানের চিটা	উড়োনে	উড়ানো
মানষির	মানুষের	নতা	লতা
সেগুন	সেগুলো	থাহে	থেকে/থাকে
খুপ	খুব	নাদা/রাদা	রান্না
মুদিন	ভেতরে/মধ্যে	গাঙ	নদী
খায়া	খেয়ে	এ্যাট্টা	একটা
ওলো	মেয়েলি সম্বোধন	কই	কোথায়
কত্তেছে	করছে	খাড়া	দাঁড়ান
আহারে	দুঃখ সংক্রান্ত উক্তি	ছ্যামা	ছায়া
হাল করা	বিরক্ত করা	হ্যালা হ্যালা	একা একা
ভাত যা টানবিনি	ভাত বেশি খাবে	কতা	কথা
রাদেছে	রান্না করেছে	কচ্ছে	বলছে
জামা	শার্ট	জাগা	জায়গা/স্থান
আগলা	আলগা	চোহি	চৌকি
থাহলো	থাকলো	থো	রাখা/রাখ
ছিড়া মিড়া	ছেঁড়া বস্ত্র/জিনিস	গ্লাস-ম্লাস	গ্লাস-বাটি
খাবানা	খাবে কি না	ব্যাড়ে বোনে	মারবোনে
ঢালতিছির	ঢালছে	যায়া	গিয়ে
নাপঝাপ/লাবটাব	লাফঝাপ	পাহা	পাকা
থুয়ে	রেখে	জারো	দুষ্টু/শয়তান
ভোল/ভৌল	তামাশা	শুকেবিনানে	শুকাবে না

মাজে	মেজ	কল্লো	করলো
শ্যাষ	শেষ	আসপি	আসবে
কুনায় কুনায়	কোনে কোনে	কয়	বলে
কতায় কতায়	কথায় কথায়	নাহি	নাকি
আসপিনানে?	আসবে না	খাবি	খাবে
তাওয়ামুহো	তাওয়ার মতো মুখ	য্যাতো	যত
বহেক	বকেক/বকা	প্যাচ্ছিনে	পারছিনে
সুমোর	সময়/একসাথে	ছুলা	ছোলা
মালকুচা	আঁটোসাঁটে কাপড় পরা	রানতি	রাঁধতে
কামই	অনুপস্থিত	পারলি	পারলে
তুলবিনি	তুলবে	ইটু	একটু
কব্বরে	কবরে	নুজা	রোজা
হাবাতে	পেটুক	আহুনু	এখনো
অচামিতি	বিনা কারণে	কাম	কাজ
মাত্তি	মারতে	গ্যালো	গেল
শয্য	সহ্য	কট্টি	কতগুলো
		সপ	সব
ক্যামমো	কেমন করে	অ্যাড়ে	এঁড়ে
ব্যাড়ায়	বেড়ায়	আইছে	এসেছে
খুচ্চো	ভাঙ্গানো/খরচা	অপিস	অফিস
দিলি	দিলে	কচ্ছি/কচ্চি	বলছি
থাকতি	থাকতে	ভদ্দিন	সারাদিন
বিষ্টি/দ্যাওয়া	বৃষ্টি	গংবগব	মুষলধারে
পারবোনানে	করবো না/পারবো না	বুচতি	বুঝতে
নাবে	নেমে	হবি	হবে
আলি	এলি	থাহা	থাকা
খ্যায়া	খেয়ে	দেহলি	দেখলে
উটে	উঠে	প্যান	প্যান্ট
বুজেগিছি	বুঝতে পেরেছি	কুহুর/কুত্তে/কুত্তা	কুকুর
কইছিলাম	বলেছিলাম	পানশো	স্বাদহীন
ব্যাল	বেল	অ্যাতো	বেশি/এত
		অ্যাহুন	এখন
পাতে	খাবারযুক্ত প্লেট	বাল	বাল্ব
দিবাইতো	দেওয়া উচিত		
কতা-বাত্তারা	গল্প-গুজব	নাগে	লাগে
তুরা	তোরা	থোন	রাখেন

ল্যাকতেছে	লিখছে	ফন্দি/ফুন্দি	কায়দা/কানুন
দ্বারে	দুয়ারে	বানতি	বাঁধতে
পাল্লাম	পারলাম	ওকেনে	ওখানে
কবো নানে	বলবো না	কইচোল	ঝামেলা (মেয়েরা বলে)
শুমোন্দি	স্ত্রীর বড় ভাই/গালি দেওয়ার শব্দ (পুরুষের ক্ষেত্রে)	কিদো	কি যেন (মেয়েরা বলে)
গুডাদু/গুটাদু	অল্প	উচো	উঁচু
এট্টু	একটু	জন্তনা	যন্ত্রণা
জ্যাম্মা-শ্যাম্মা	যেমন-তেমন	কত্তেছে	করছে
দেকি	দেখি	রইছে	রয়েছে
অ্যাকবারে	একসঙ্গে	তফাত	দূরে
জাগা	জায়গা/ঘুম ভাঙানো	ভাতার	স্বামী
গুছাগুছো	গোছগাছ করা	গ্যাদা	ছোট
শেনতে	সেখান থেকে	আরাটা	আরেকটা
মাটেমাটে কল্লি	এলোমেলো করলে	ব্যাপসা	ব্যবসা
নাতি	লাথি	টুক করে	চুপিসারে
বুজাই	অনেক/বেশি	আশপদ্দা	সাহস
কয়ডা বাজে	কত বাজে	শ্যারে	সব
মজার	সুন্দর	কত্তাম	করতাম
মাতব্বর	গ্রাম্য-প্রধান	ফুকচি/ফুকচি	উঁকি
কবো	বলবো	বহিচি	রাগ করেছি
ব্যাতা	ব্যাথা	হুড়পাড়	তাড়াতাড়ি
প্যাট	পেট	কোন	কোথায়
ঘাতোনি/ঘুতোনি	মারধর	মুড়ো	শেষ
কোলো	বলল	ছুটা/সুডা	সোডা
তারিক	তারিখ	চহরা-বহরা	নকশা করা
ন্যাওট	ঘোরা (বৃত্তাকারে একবার)	নুচ্চো	লম্পট
মান্নি	মান্য	আরাগ	আরেক
ত্যায়গা-শিনগা	তারপর	ওন্না/উওরনা	তার না
খুতি	থলে	খান্টেক	অল্প/একটু
পন্তু	পর্যন্ত	নিলে বুজিনে	ধরন বুঝিনে
কোন	কোথায়	পিসার	প্রেসার
পুশকনী	পুকুর	জুলা	কারিগর
শিয়েল	শিয়াল	হোনে	ওখানে
শিশি	বোতল	দুপোর	দুপুর
চেরাগ/চ্যারাগ	প্রদীপ/বাতি	চিয়ার	চেয়ার

ছাতি	ছাতা	জষ্টি	জ্যৈষ্ঠ
বাগ	বাঘ	ভাদোর	ভাদ্র
খ্যাতা	কাঁথা	কাহর	কাঁকর
পুহু	পোকা	ব্যাতা	ব্যথা
বাগুন	বেগুন	ল্যাপ	লেপ
ডালি	ঝুড়ি	ঠান্টা	ঠান্ডা
গাবলা	গামলা	মিত্যে	মিথ্যা/মিথ্যে
শলা	ঝাটা	পিজ	পিঁয়াজ
কোবরেজ	কবিরাজ	বদনী	বদনা
ইচে	চিংড়ি	ইস্কুল	স্কুল
ব্যাত	বেত	গোশত	মাংস
জ্যাট্কুট	যতটুকু	মিত্যে/মিত্তে	মিথ্যে
নে লো	নিতে বলা (মেয়েলি সম্বোধন)	কইছি/কইচি	বলেছি
নাগানো	লাগানো	রে লো	মেয়েলি সম্বোধন
কলাম	বললাম	কবো নানে	বলবো না
		উচো	উঁচু
দ্যাহেন/দ্যাকেন	দেখেন	এদ্যা	এ দেখ
নাহি	নাকি	লেকতি	লিখতে
মাজা/মাজে	ধোয়া/পরিষ্কার করা	চুচা	খোসা
নিয়াই	আনো/আনা	কবো	বলবো
নিবা	নেবে কিনা	কুটি	ছোট
যাস	যাওয়া/যাবে	ফ্যালা	ফেলে
দিয়াইছিস	দিয়ে এসেছে কি না	ডা/ডে	টা
বদলাতি	পরিবর্তন করা	বেল	বেল্ট
যাচ্চির/যাচ্ছিস	যাচ্ছ/যাওয়া	গুঁতো	খোঁচা/আঘাত
কাদা/ক্যাদা	কাদা/ভেজা মাটি	কাবু	চিকন
ডাহেন	ডাকেন	সুমায়	সময়
আলগোচে	চুপিসারে	জুয়ান	যুবক/যুবতী
ও যে	ঐ যে	কাচ	কাজ
তয়গা/ত্যায়গা	তারপর	মাপ	মাফ
মাজে-সাজে	মাঝে-মধ্যে	ছ্যাপ	থু তু
গরিপ	গরিব	নাগ	রাগ
কিরাসিন	কেরোসিন	কয়টাহার	কত টাকার
কামকাজ	বিয়ে সংক্রান্ত	এই তোরে	এ দিকে
কতি	বলতি	পাননে	পারিনে
নেকক/লেকক	লেখক	টপকরে	তাড়াতাড়ি

অনকো	অচেনা/অপরিচিত	আজুড়ে	শুধু (খারাপ অর্থে)
খ্যাড়	খড়	চুনোমাছ	ছোট মাছ
		পত	পথ/রাস্তা
ছ্যাড়া	ছেলে	খ্যাড়	খড়
ছেড়ি	মেয়ে	কওয়া	বলা
বিলেয়	বিড়াল	তবন	লুঙ্গি
ঢুকশা	মালসা	বিছেন	বিছানা
সুবরি	শুপারি	কুষ্টা	পাঠ
কুষ্টে	কুষ্টিয়া	মশোরি	মশারি
হুড়ম	মুড়ি	হাশেল	রান্নাঘর
ম্যাজ	ম্যাচ	ফেসারি	খেসারি
বোরই	কুল	তামান দিন	সারা দিন
কদু	লাউ	মামু	মামা
কুশর	আখ	মামানী	মামী
নিয়ের	কুয়াশা/শিশির	পাখি/পক্কী	পাখি
আটি/বিচি	বীজ	ঘুড়া	ঘোড়া
খাজোর	খেজুর	মাটেল	ডোবা
আমশবরি	পেয়ারা	খোপ	রুম
দোহান	দোকান	পিটে	পিঠা
কাহই	চিরুনী	ত্যাল	তৈল
ঝাল	মরিচ	মিরকে	মৃগেল
কুমোরখালী	কুমারখালী	গাড়	ফোঁড়া
পানিটিশে	পানি পিপাসা	লোগ	নখ
চৌত	চৈত্র	নিড়েন	নিড়ানি
ম্যাগ	মেঘ	জানলা	জানালা
অ্যাকুন	এখন	কামে	কাজে
পুযিনি	পূর্ণ হয় নি/কম পড়েছে	নাত/লাত	রাত
সরা/চাপিন/ঢাকুন	ভাতের হাঁড়ির মুখে দেওয়া ঢাকনি	ঠিলে	কলস
মানা/বারন করা	নিষেধ করা	হ্যালাহ্যালা	একা একা
বহন/বকন বাছুর	মেয়ে বাচ্চা (গরু)	চেনি	চিনি
নোদ	রোদ/সূর্যের আলো	আদার	অন্ধকার

ওপরে যে সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দেখানো হয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কুমারখালীর নিরক্ষর লোকেরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করেন। কুমারখালীর কৃষ্ণপুর গ্রামের নিরক্ষর লোকদের ব্যবহৃত ভাষার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো; যেমন–

ক. হ্যালা হ্যালা কতা কচ্ছে।
অর্থ : একা একা কথা বলছে।
খ. এই ছ্যাড়া কোন যাচ্ছিস?
অর্থ : এই ছেলে কোথায় যাচ্ছিস?
গ. খ্যায়া খ্যায়া ব্যাঙ হয়ছে।
অর্থ : খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে।
ঘ. পেপো খাবি?
অর্থ : পেঁপে খাবি?
ঙ. কম স্যারা হয়ছে?
অর্থ : কাজ শেষ হয়েছে?
চ. খাতি বইছে/বইচে কোন দ্যাহো?
অর্থ : দেখ তো কোথায় খেতে বসেছে?
ছ. আজুড়ে কামে কতি যাব ক্যা?
অর্থ : শুধু শুধু বলবো কেন?

উপরের ক, খ, গ এবং ছ নম্বরের উদাহরণের বাক্যগুলো সাধারণত মহিলারা ব্যবহার করেন। ঘ, ঙ এবং চ নম্বরের উদাহরণের বাক্যগুলো পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ব্যবহার করেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে অঞ্চলগত পার্থক্যের কারণে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। যেমন–

ক. আমা বাড়ি য্যাবের চাইছিলে।
ক´. আমা বাড়ি যাতি চাইছিলে।
অর্থ : আমাদের বাড়িতে যেতে চেয়েছিলে।
খ. দাদা আম দিলে।
খ´. দাদা আম দিল।
অর্থ : দাদা আম দিল।

ওপরের ক এবং খ নম্বরের উদাহরণের বাক্য দুটি কুমারখালীর মালিয়াট, দুর্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ক´ এবং খ´ বাক্য দুটি মধুপুর, পান্টি, কৃষ্ণপুর ইত্যাদি এলাকায় ব্যবহৃত হয়। গড়াই নদীর একপাশে অর্থাৎ শহরের পাশের এলাকা হলো মালিয়াট, দুর্গাপুর ইত্যাদি। গড়াই নদীর অপর পাশে মধুপুর, পান্টি ও কৃষ্ণপুর ইত্যাদি এলাকা। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, গড়াই নদীর যে পাড়ে পৌর এলাকা অবস্থিত নয়, সে এলাকার জনগোষ্ঠীর ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি চলিত ভাষার কাছাকাছি। অন্যদিকে পৌর এলাকা ছাড়া পৌর এলাকার পাশের বড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাষায় আঞ্চলিকতার ভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

অতীতকালের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়ার 'এ' বিভক্তির বিষয়টি গড়াই নদীর যে পাশে পৌর এলাকা অবস্থিত সে এলাকার গ্রাম্য পরিবেশের জন্য প্রযোজ্য। কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে শহরের নিরক্ষর ও সাক্ষর ভাষা-ভাষী যারা ভাষা ব্যবহারের প্রতি সচেতন নয়, তাদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু গড়াই নদীর অপর পাশের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য নয়। ক´ ও খ´ নম্বর উদাহরণে বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

নিরক্ষর লোকদের মধ্যে বড় রকমের সামাজিক স্তরবিন্যাস রয়েছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যার বহির্প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি বলা হচ্ছে এ জন্য যে, ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে সম্মান করা যায়, আবার ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে অপমানও করা যায়। ভাষা দিয়ে মানুষকে আঘাত করা যায়, আবার ভাষা দিয়ে মানুষকে খুশিও করা যায়। বাচনভঙ্গির ধরন ও সর্বনামের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

নিরক্ষর লোকদের শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়টি অর্থাৎ টাকা-পয়সার বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বংশগৌরব এবং উঁচু স্তরের আত্মীয়-স্বজনও কোন কোন ক্ষেত্রে মর্যাদা বা মানসম্মান বাড়িয়ে থাকে। তবে বংশগৌরব কিংবা উঁচু স্তরের আত্মীয়-স্বজন থাকলেই কারও মর্যাদা বেশি দিন টিকে থাকে না, যদি না সে তার নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। নিজের অবস্থার উন্নতি বলতে আর্থিক বিষয় বোঝানো হচ্ছে।

কুমারখালীতে আপনি, তুমি, তুই, আপনারা, তারা, তোরা, তোমরা ইত্যাদি সর্বনাম অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিরক্ষর লোকেরা সাধারণত আপনে, আপনেরা, তুই, তুরা, তুমরা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন–

সর্বনাম	**কুমারখালীতে সর্বনামের ব্যবহার**
আপনি	আপনে (**'ই'** ধ্বনি; 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)
আপনারা	আপনেরা ('আ' ব্যঞ্জন ধ্বনির পরের ধ্বনি, ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে গিয়ে 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)
তোমরা	তুমরা ('ও' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)
তোরা	তুরা ('ও' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)

কুমারখালীতে বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে সাধারণত 'আপনি' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে দিনমজুর ও গরিব শ্রেণীর বয়স্ক লোকদের সাথে 'আপনি' ব্যবহৃত না-হয়ে 'তুমি' ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সমবয়স্কদের ক্ষেত্রে 'তুই' এবং কখনও কখনও 'তুমি' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুমারখালীতে 'তুমি' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয় স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে। এখানে লক্ষণীয় যে, বয়স্ক গরিব লোকদের সাথে যে 'তুমি' ব্যবহৃত হয়, স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে ঠিক সে 'তুমি' ব্যবহৃত হয় না। 'তুমি' সর্বনামটির অর্থ সব সময় এক থাকে না। কখনো 'তুমি' তুচ্ছার্থে, কখনো সম্মানার্থে, কখনো বা হৃদয়ের গভীর ভালবাসার বহির্প্রকাশ ঘটে থাকে 'তুমি' সর্বনামটি ব্যবহারের মাধ্যমে। বাবা বা মাকে যখন 'তুমি' বলে সম্বোধন করা হয়, তখন 'তুমি' সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। গরিব দিনমজুরকে যখন 'তুমি' বলা হয়, তখন 'তুমি' ব্যবহৃত হয় তুচ্ছার্থে এবং স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে ব্যবহৃত 'তুমি' ভালবাসার আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ছোটদের সাথে 'তুই' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধনী ও উচ্চ পরিবারের শিশুকে কোন নিরক্ষর লোক 'তুই' বলেন না। শিশু ছেলে হলে বাবা, বাজান, চাচা, মামা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়

এবং মেয়ে হলে মা, খালা, ফুফু ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। কিন্তু নিরক্ষর ও গরিব ঘরের শিশুর সাথে কেউ আদরের সাথে কথা বলে না। তাদের সাথে 'তুই' ব্যবহৃত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে 'তুই' তুচ্ছার্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নিরক্ষর লোকেরা কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে 'তুই' সর্বনাম ব্যবহার করে থাকেন। তবে মহিলারা কিন্তু স্বামীকে কখনও 'তুই' বলেন না। নিরক্ষর মহিলারা স্বামীকে 'তুই' বলা বেয়াদবী মনে করেন। মুসলমান নিরক্ষর মেয়েরা মনে করেন স্বামী হলো গুরুজন, স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত, তাই স্বামীকে 'তুই' বলা যায় না। এখানে স্ত্রীকে যে অর্থে 'তুই' বলা হয়, সে অর্থে কিন্তু গরিব দিনমজুর ঘরের ছোট ছেলে বা মেয়েকে 'তুই' বলা হয় না। 'তুই' কখনও তুচ্ছার্থে, কখনো সাধারণ অর্থে, কখনও বা ভালবাসার আধার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যার উদ্দেশে ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ পাত্রের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এজন্যই সর্বনামের ব্যবহারের বিষয়টি একটি সূত্রের বা ছকের মাধ্যমে ফেলা যায় না। একটি জীবন্ত ভাষার ভাষা ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য আছে তা হাতে গুণে বলা যায় না। অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ভাষিক বাক্যিক গঠনপ্রণালীই হলো একটি জীবন্ত ভাষার রূপ-অলংকার।

কুমারখালীর ভাষায় আপনি, তুমি, তুই, আপনারা, তারা, তোরা, তোমরা ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহৃত না হয়েও বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন–

ক. কি রে যাবি নে?

খ. কি গো যাবা না?

গ. কি ব্যাটা যাবা না?

ঘ. কি গো বাপু যাবা না?

ঙ. বুড়োর ব্যাটা যাবা না?

ওপরের 'ক' এবং 'ঙ' নম্বর বাক্য দুটির শ্রেণী বিশেষভাবে রক্ষিত। 'ক' নম্বরে 'কি রে' ব্যবহৃত হয় সাধারণত সমবয়স্ক কিংবা মর্যাদাশীল নয় এমন ব্যক্তির উদ্দেশে। 'ঙ' নম্বরের 'বুড়োর ব্যাটা' বলতে বয়স্ক লোককে বোঝানো হয়েছে এবং একই সাথে সে সামাজিকভাবে ততটা মর্যাদাশীল নয়। ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ নম্বরের বাক্যগুলির যা অর্থ তা হলো, কাউকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে, 'সে যাবে কিনা?'

নিরক্ষর মুসলমানেরা পিতাকে 'আব্বা', 'বাজান' কিংবা বাপ বলে সম্বোধন করে থাকেন। তবে পিতাকে 'আব্বা' বলার প্রচলনই বেশি লক্ষ করা যায় এবং মাতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। নিরক্ষর ও নিম্ন-পরিবারের লোকেরা বাবা-মার সাথে 'তুই' সর্বনাম ব্যবহার করে থাকেন। মাতার ক্ষেত্রে 'তুই' সম্বোধনসূচক সর্বনাম ব্যবহার করার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। হিন্দুরা পিতাকে কখনও 'আব্বা' বলেন না, 'বাবা' বলে সম্বোধন করেন। মাতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। মুসলমানেরা পিতার ভাইকে 'চাচা' বলেন কিন্তু হিন্দুরা পিতার বড় ভাইকে 'জ্যাঠা' বলেন এবং ছোট ভাইকে 'কাকা' বলেন ও পিতার বোনকে 'পিসি' বলে সম্বোধন করে থাকেন। মুসলমানেরা পিতার বোনকে 'ফুফু' বলেন ও মাতার বোনকে 'খালা' বলে সম্বোধন করেন। হিন্দুরা মায়ের বোনকে 'মাসি' বলেন।

কুমারখালীতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্বোধনসূচক ও ধর্মীয় কারণে ধর্মসংক্রান্ত কিছু শব্দ ছাড়া ভাষার ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই রকমের, 'একই ভাষাভাষী লোকের মধ্যেও সমাজভেদে ভাষা-ব্যবহারে তারতম্য ঘটে। তার প্রধান উদাহরণ হল বাংলা-ভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ভাষা। হিন্দুরা নমস্কার করেন, মুসলমানেরা সালাম বা আদাব জানান, হিন্দুরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, মুসলমানেরা দাওয়াত কবুল করেন, হিন্দুরা জল পান করেন, মুসলমানেরা পানি খান, হিন্দুরা ভাত খেয়ে আঁচান, মুসলমানেরা খানাপিনা করে হাত-মুখ ধোন, মুসলমানেরা 'চাচা' বলে আপন প্রাণ বাঁচালেও, হিন্দুরা, 'কাকা' বলে ফাঁকা আওয়াজ করেন না। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এই যে ভাষাগত তারতম্য, একেও 'সামাজিকতার ভাষা' না বলে উপায় নেই।[৫]

সমাজের নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ভাষার মাধ্যমে সমাজের নিয়ম-রীতি প্রতিফলিত হয় বলেই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে অবস্থান করছে। মানুষের সব থেকে বড় হাতিয়ার হলো তার ভাষা। ভাষার সুচারু ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার সব কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে। একই সমাজে কিংবা একই পরিবারেই সাক্ষর ও নিরক্ষর লোকের বাস। সাক্ষর লোকের ভাষা পরিবারে এমন দুর্বোধ্য হয় না, যা নিরক্ষর লোক বোঝেন না। অথবা নিরক্ষর লোক এমন ভাষা ব্যবহার করেন না, যা সাক্ষর লোকের ভাষার মান রক্ষিত হয় না। আসলে একই অঞ্চলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া একই ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়।

নিরক্ষর লোকদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অকৃত্রিমতা লক্ষ করা যায়। নিরক্ষর লোকেরা ভাষার ধ্বনি, রূপ, শব্দ কিংবা বাক্য কি তা জানেন না। এই না-জানার কারণে ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুদ্ধতার কিংবা অশুদ্ধতার প্রসঙ্গ আসে না। গ্রামভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক কিছু বৈচিত্র্য ছাড়া কুমারখালীর নিরক্ষর লোকেরা প্রায় একই ধরনের ভাষায় ভাব বিনিময় করে থাকেন। ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য, যেমন :

ক. কুকুরটা খ্যাদ তো
খ. কুকুরটা বাড়ে তো
গ. কুকুরডা বাড়ে তো
ঘ. কুকুরডা দাবড়া তো
ঙ. কুত্তা খ্যাদা তো
চ. কুত্তে খ্যাদা তো
ছ. কুত্তাডা মার তো
জ. কুহুরডা মার তো

কুমারখালীর কৃষ্ণপুর, বিলকাটিয়া, ডাঁশা, বশিগ্রাম, পান্টি, বহলবাড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চলে 'কুকুর'কে 'কুকুর' অথবা 'কুহুর' বলা হয়। কিন্তু যে-অংশে কুমারখালীর পৌরসভা অবস্থিত সে অংশের লোকেরা; এমনকি পৌরসভার আশে-পাশের লোকেরা 'কুকুর'কে 'কুত্তা/কুত্তে' বলে থাকেন। 'খ্যাদা' 'বাড়ে' 'দাবড়া'; 'মার' শব্দগুলির অর্থ হলো 'তাড়ানো'। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ এবং জ নম্বরের বাক্যগুলি দ্বারা কোন একজনকে উদ্দেশ্য করে 'কুকুর' তাড়াতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কুমারখালীর সমগ্র এলাকার ভাষাভাষীরা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ এবং জ নম্বরের উদাহরণের বাক্য বোঝেন। তবে যে এলাকায় 'কুত্তা/কুত্তে' ব্যবহৃত হয় না, সে এলাকার লোকেরা কুকুরকে 'কুত্তা/কুত্তে' বলাটা হাস্যকরও মনে করে থাকেন।

একই বৃহৎ অঞ্চলের ভাষার পার্থক্যের রূপ কিন্তু ঐ এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলেও খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। ভাষার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে সে ভাষার ব্যবহার সংকুচিত না হয়ে পারে না। গ্রহণযোগ্যতা না-থাকলে তার প্রায়োগিকতা অনেকাংশে হ্রাস পেতে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য কারণে ভাষায় যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় সে পার্থক্যই ভাষার উপভাষাগত অবস্থানটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিরক্ষর লোকদের 'কুহুর' শব্দটি বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়। দুর্গাপুর, মালিয়াটি, আগ্রাকুন্ডা, ছুন্দা, চড়াইকোল ইত্যাদি এলাকায় 'কুত্তা/কুত্তে' ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

নিরক্ষর মহিলারা তাদের স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। বিষয়টি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। স্বামীর নাম ধরে ডাকলে 'পাপ' হবে, সে জন্য হিন্দু মহিলারা স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। তবে মুসলমান অল্পবয়স্ক মহিলারা পাপের বিষয়টি না-বললেও তারা স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। বয়স্ক নিরক্ষর মুসলমান মহিলারাও স্বামীর নাম ধরে ডাকা 'পাপ' মনে করেন। স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে হবে এমন বিষয় থেকে মহিলারা দূরে সরে যায়। এমনকি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় পর্যন্ত নিরক্ষর মহিলারা স্বামীর নাম বলতে চান না, বা বলেন না। পরিচিত অন্য কেউ সেই মহিলার স্বামীর নাম বলে দেয়।

নিরক্ষর লোকেরা উদ্দেশ্যহীনভাবে কখনও কখনও কথা বলে থাকেন। যেমন–

ক. অ্যাহুনু লোক আছেরে ডাঙায়?

খ. অ্যাহুনু ডাঙায় মানুষ আছেরে?

ওপরের ক ও খ নম্বরের বাক্য দুটির অর্থ হলো, 'নদীর তীরে এখনও কিছু লোক আছে।' কুমারখালীর গড়াই নদীর ঘাট থেকে বাক্য দুটো সংগ্রহ করা হয়েছে। খেয়া নৌকার যা ধারণ ক্ষমতা তার থেকেও অধিক লোক নৌকায় উঠেছে, তারপরেও নদীর কূলে বেশ কিছু লোক থাকায়, ঐ রকম বলা হয়েছে। 'অ্যাহুনু লোক আছেরে ডাঙায়', বাক্যটি বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় নি। তবে বক্তার বিস্ময়কর উক্তি বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কুমারখালীতে এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কুমারখালীতে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার আছে, যা একই জাতীয় জীব-জন্তুকে বোঝায়। যেমন–

	শব্দ	অর্থ
ক.	গাই	গাভী
খ.	দামড়া	চাষের কাজের জন্য খাশি করা গরু
গ.	আড়ে	ষাঁড় (খাশি করা হয় নি)
ঘ.	বকন	মেয়ে গরু (যার বাচ্চা হয় নি)
ঙ.	আড়ে বাছুর	পুরুষ শিশু গরু
চ.	বকন বাছুর	মেয়ে শিশু গরু

ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ নম্বর উদাহরণের প্রতিটিই গরু। গরুর মধ্যে পুরুষ গরু এবং মেয়ে গরু রয়েছে। কিন্তু বয়সের ও কাজের ভিত্তিতে নানা নামে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। আবার,

ক. কুকড়ো

খ. কুহড়ো

গ. কুহরো

ঘ. মোরগ

ঙ. মুরগি

চ. মুরগির বাচ্চা

ছ. কুহড়োর ছাও

মোরগ এবং মুরগীর সাধারণ নাম কুমারখালীতে 'কুকড়ো'। তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মোরগ এবং মুরগীও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাগলকে কুমারখালীর লোকেরা নানাভাবে চিহ্নিত করে থাকেন; যেমন–

	শব্দ	অর্থ
ক.	ধাড়ি	মেয়ে ছাগল (অন্তত একবার বাচ্চা হয়েছে)
খ.	পাটি	মেয়ে ছাগল (একবারও বাচ্চা হয় নি)
গ.	খাশি	পুরুষ ছাগল (কাটান দেয়া হয়েছে অর্থাৎ খাশি করা হয়েছে)
ঘ.	পাটা/পাঁঠা	পুরুষ ছাগল (কাটান দেয়া হয় নি অর্থাৎ খাশি করা হয় নি)
ঙ.	আবলোস/আবলুস	মেয়ে ছাগল (কোন দিন বাচ্চা হয় নি, বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই)
চ.	ছাগলের বাচ্চা	শিশু ছাগল (মেয়ে অথবা পুরুষ)

অর্থাৎ একই জীবের নানা নাম কুমারখালীতে ব্যবহৃত হয়। একই জীবের নানান রকম নাম ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্যও আছে। প্রতিটি নামের বিশেষ অর্থ আছে। সে অর্থ পশুর বা জীবের বয়সভিত্তিক অথবা অবস্থাভিত্তিক শ্রেণী নির্দেশ করে। ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। কুমারখালীতে 'কাটান দেয়া'কে 'খাশি করা' বোঝানো হয়ে থাকে।

নিরক্ষর লোকেরা প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। ডাক্তার ও শিক্ষককে তাঁরা বেশ মর্যাদা দেন। অল্প-পরিচিত শিক্ষককে স্যার এবং পরিচিত শিক্ষককে মাস্টের ভাই, মাস্টের চাচা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেন। থানা সদরের ডাক্তারকে ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাব ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকেন। গ্রামের পরিচিত ডাক্তারকে সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী ডাক্তার ভাই, ডাক্তার, ডাক্তার মামু ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। পুলিশকে কুমারখালীর গ্রামের নিরক্ষর লোকেরা বেশ ভয় করে চলেন। পুলিশের ক্ষেত্রে 'মর্যাদা' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছেনা এজন্য যে, কুমারখালীর গ্রামের নিরক্ষর লোকদের মধ্যে এখনও এমন ধারণা আছে যে, পুলিশ যখন তখন যাকে তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পুলিশের ক্ষমতা আছে। 'মর্যাদা' ও 'ভয়' শব্দ দুটি এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 'মর্যাদা' দেয়া হলো মন থেকে কাউকে সম্মান করা এবং 'ভয় করা'

হলো ক্ষণিকের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউকে মান্য করার ভাব করা। পুলিশকে স্যার বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। পুলিশের মধ্যে চাকরিগত স্তর আছে। কে অফিসার, কে হাবিলদার, কে কনস্টেবল ইত্যাদি বিষয়ে নিরক্ষর লোকেরা তেমন খোঁজ-খবর রাখেন না। কুমারখালীর নিরক্ষর লোকেরা পুলিশ কনস্টেবল শব্দের সাথে খুব একটা পরিচিত নয়। তবে পুলিশ কনস্টেবলকে কেউ কেউ 'পুলিশের সেপাই' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। পুলিশ বাদে থানা সদরের অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন কৃষি অফিসার, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বা অন্যান্য পেশার বড় কর্মকর্তাদের নিরক্ষর লোকেরা খুব একটা মর্যাদা দিয়ে চলেন না। মর্যাদা না-দেওয়ার মূলে যে কারণ রয়েছে তা হলো, কোন কোন অফিসারের কি কাজ বা কে কোন অফিসার এ বিষয়টি অধিকাংশ গ্রাম্য নিরক্ষর লোকেরাই জানেন না।

নিরক্ষর লোকদের ভাষা ব্যবহার ও ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হলো, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব যোগাযোগ ও সামাজিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে চলে থাকেন। এই অবস্থা ও সামাজিকতা ভাষার ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই নিরক্ষর হলেই যে বিশেষ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, তা বলা যায় না। তবে সাক্ষর ভাষাভাষী অপেক্ষা নিরক্ষর ভাষাভাষীরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অসচেতন এ কথা বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. মনসুর মুসা (সম্পা), *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী,* ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫৩৮
২. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১৩৮
৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'বাংলাদেশী বাংলার আদর্শ অভিধান : ভূমিকা', হুমায়ূন আজাদ (সম্পা), *বাঙলা ভাষা* (২য় খণ্ড), ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৯১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৫. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯